পুতনা মোক্ষ লীলা

ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

১. পূর্বকথা:
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা কংসের কারাগারে দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। এর পর কৃষ্ণের নির্দেশেই বসুদেব তাঁকে নন্দালয়ে রেখে যশোদা ও নন্দ মহারাজের সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে কারাগারে ফিরে আসেন। এই মেয়েটি ছিলেন আসলে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া। পরে কংস তাঁকে হত্যার জন্য সজোরে পাথরের উপর নিক্ষেপ করলে তিনি অষ্টভূজা দেবী রূপ ধারণ করে আকাশে অবস্থান করে বলেন যে কংস যে বধ করবে সেই ভগবান ইতিমধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। একথা শুনে কংস তার দুষ্ট মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করেন। তারা সবাই বলেন যে কংসের শত্রু ভগবানকে বিনাশ করার জন্য নগর, গ্রাম এবং ব্রজের সব স্থানে ১০ দিনের কমবয়সী এবং ১০ দিনের কিছু বেশী বয়সী শিশুদেরকে হত্যা করতে হবে। তাহলেই কংসের পূর্বকথিত শত্রু নিহত হবে।

মহারাজ নন্দের পুত্র হয়েছে - এই সংবাদ শুনে ব্রজবাসীরা বহুমূল্যবান উপহার নিয়ে নবজাত শিশুকে দেখার জন্য নন্দালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। চারদিকে একটা আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগলো। গোপনারীগণও এই আনন্দ উৎসবে পিছিয়ে ছিলেন না।

২. কংস কর্তৃক পুতনা রাক্ষসীকে প্রেরণ :
কংসের অনেক আসুরিক স্বভাবের বেশ কিছু অনুচর এবং অসুর ও রাক্ষসী ছিল। তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে কংসের যে কোন আদেশ পালন করতো। কংস ভগবান কৃষ্ণের বিনাশের জন্য অতি ভয়ঙ্করী পুতনা রাক্ষসীকে ব্রজমন্ডলে পাঠালেন। এই রাক্ষসী তখন ব্রজের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করে শিশু হত্যা আরম্ভ করলো।

পুতনা ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারত। তাই সে সুন্দরী স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে নবজাত শিশুর গৃহে প্রবেশ করত এবং তাকে সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে তার বিষ-মিশ্রিত স্তন পান করিয়ে শিশুর প্রাণ নাশ করত। এই ছিল পুতনার শিশু হত্যার কৌশল। এই কৌশল অনুযায়ী পুতনা একদিন অতি সুন্দরী ব্রজ-রমণীর বেশধারণ করে নন্দালয়ে প্রবেশ করে। সে চালাকি করে যশোদা-রোহিনী সহ অন্যান্য ব্রজ রমণীদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নন্দের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে। সেখানে বিছানায় শায়িত শিশু ভগবান কৃষ্ণকে দেখতে পেল। ছাই চাপা আগুন যেমন উপর থেকে বোঝা যায়না, সেইরূপ বাল-মাধুর্যে আচ্ছাদিত পরম পুরুষ কৃষ্ণকে পুতনা সাধারণ শিশু বলেই মনে করল।

৩. পুতনাকে আসতে দেখে কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করলেন:
ব্রজ-রমণী রূপী রাক্ষসী পুতনাকে আসতে দেখে শিশুরূপী ভগবান কৃষ্ণ তাঁর চোখ বন্ধ করলেন - এই কথাই শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন। প্রশ্ন হলো এই কথা বিশেষ করে বলার সার্থকতা কোথায়? সাতদিনের শিশুতো বেশীরভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায় অথবা চোখ বন্ধ করে রাখে। তাই গোপী বেশধারী পুতনাকে আসতে দেখে কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করলেন - এই অবস্থাতো সাধারণ শিশুর মতোই ব্যবহার হয়েছে। এতে আর বিশেষ কি আছে? তবে কথা হলো যে ভক্তের কাছে ভগবানের প্রীতিটি ভঙ্গীই অর্থবহ এবং রসবহ। কৃষ্ণের এই সামান্য চোখ বন্ধ করার মধ্য দিয়ে তাঁর মনন এবং রস আস্বাদনের জন্য শুকদেব গোস্বামী বিশেষ করে পরীক্ষিত মহারাজকে শিশুর চোখ বন্ধ করার বিষয়টি বলেছেন। তবে এই সম্পর্কে শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ তাঁর বৈষ্ণবতোষণী গ্রন্থে কৃষ্ণের চোখ বন্ধ করার পিছনে চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন।
(ক) প্রথমত, শিশুর সাধারণ স্বভাব এই যে তারা কিছুক্ষণ জেগে থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তাছাড়া শিশুরা মায়ের কাছে আনন্দে খেলা করে। কিন্তু অপরিচিত লোক দেখলে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে। কৃষ্ণও সাধারণ শিশুর মতো ব্যবহার এক্ষেত্রে করেন। এভাবে তিনি তাঁর বাল্য-লীলার মাধুর্য্য প্রকাশ করলেন।

(খ) দ্বিতীয়ত, চোখ বন্ধ করার ২য় কারণ হিসেবে গোস্বামীপাদ বলেছেন যে ভগবান অন্তর্যামী। সকলের মনের ভাব জানতে পারেন। পুতনা কংস প্রেরিত এক রাক্ষসী - একথা অতি সহজেই বুঝতে পারেন ভগবান। সে এসেছে ব্রজের

সদ্যোজাত শিশুদেরকে হত্যা করতে - একথা কৃষ্ণের অজানা নয়। এদিকে ব্রজের শিশুরা হলো কৃষ্ণের সখা; তাঁর পরম ভক্ত। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান - তিনি ভাবলেন পুতনা সবসময় অপরের অনিষ্ট করে বেড়ায় এবং আমার সখা ও ভক্তদের হত্যা করতে এসেছে। আমি তাই ওর মতো পাপীর মুখ দেখতে চাইনা। এজন্য তিনি চোখ বন্ধ করেছিলেন।

(গ) তৃতীয়ত, পুতনা মায়া-বিস্তার বা অবলম্বন করে নিজের আসল রূপ ঢেকে সুন্দরী গোপ-নারী সেজে নন্দালয়ে এসেছে। ভগবান হলেন জ্ঞানস্বরূপ। তাঁর কাছে মায়া কখনো আসতে পারে না। কৃষ্ণ ভাবলেন,- আমি যদি পুতনার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে তার মায়ার বেশ দূরীভূত হয়ে আসল রূপ - অর্থাৎ রাক্ষসী রূপ বেরিয়ে পড়বে। আর সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসী রূপ দেখে আমার স্নেহশীলা মায়েরা আমার অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন। এই কারণেও তিনি চোখ বুজেছিলেন।

(ঘ) চতুর্থত, গোস্বামীপাদ বলেছেন যে ভগবান জানেন পুতনার মঙ্গলের জন্য - অর্থাৎ তার মুক্তির জন্যই তাকে বধ করতে হবে। কিন্তু এই কাজটি ক্রূর এবং লজ্জাজনক। পিতামাতা সন্তানের দৌরাত্মে বাধ্য হয়ে তাদেরকে অনেক সময়ই শাস্তি দেন। কিন্তু এসত্বেও তারা মনে দুঃখও পান। একইভাবে ভগবান পুতনার মঙ্গলের জন্য তাকে বধ করতে হবে - একথা চিন্তা করে অনেকটা দুঃখে ও লজ্জায় তার দিকে না তাকিয়ে চোখ বন্ধ করেছিলেন।

৪. পুতনা ভগবানকে কোলে নিয়ে বিষ- মিশ্রিত স্তন তাঁর মুখে প্রদান করলো:

আগেই বলা হয়েছে অখিল ব্রহ্মান্ডের যিনি অন্তর্যামী, সেই ভগবান প্রাণঘাতীনী পুতনাকে আসতে দেখে চোখ বুজলেন। নির্বোধ ব্যক্তি যেমন দড়ি মনে করে সুপ্ত বিষধর সাপকে গ্রহণ করে, সেভাবে পুতনাও নিজের মৃত্যুরূপী ভগবান কৃষ্ণকে সাধারণ শিশু ভেবে কোলে তুলে নিল।

সুন্দরী গোপনারী বেশী পুতনাকে দেখে যশোদা, রোহিণী প্রমুখ অবাক হলেন। চিন্তা করলেন, একেতো কখনো দেখিনি। কিন্তু কোন বাধা দিলেন না। কারণ নবাগতা রমণীতো শিশুকে আদরই করছে। সুযোগ বুঝে পুতনা তখন শিশুটিকে মেরে ফেরাবার জন্য তার মুখে বিষমিশ্রিত স্তন প্রদান করলো। কৃষ্ণ তখন কি করলেন? শ্রীমদ ভাগবত - এর ভাষায় বলা যায়-

"তস্মিন স্তনং দুর্জরবীর্যমুশ্বনং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দন্দাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপিড্য তং
প্রানৈঃ সমং রোষসমন্বিতোহপিবৎ।।"

অর্থাৎ অতি ভয়ঙ্করী পুতনা শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে, স্পর্শমাত্র প্রাণান্তকারী অতি উগ্রবিষযুক্ত স্তন তাঁর মুখে প্রদান করলো। শিশুরূপী ভগবান তখন ক্রূদ্ধ হয়ে দুই হাতে সবলে স্তন পীড়ন / মন্থন করে পুতনার প্রাণের সাথে সেই স্তনপান করলেন।

ঐ অবস্থায় পুতনা তখন মৃত্যু যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে পড়ে এবং ছাড় ছাড়, আর স্তনপান করতে হবে না বলে চিৎকার করতে আরম্ভ করলো। তার দুই চোখ কোটর থেকে বাইরে আসার উপক্রম হলো। সর্বাঙ্গে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগলো। পুতনা বার বার হাত পা ছুড়ে শিশুকে বুক থেকে ফেলতে চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই শিশুকে বুক থেকে ছুড়ে ফেলতে পারলো না। ঐ অবস্থায় যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে পুতনা নিজের রাক্ষসী রূপ ধারণ করলো। পুতনা খেচরী বিদ্যা জানতো। এই বিদ্যার মাধ্যমে যে কেউ আকাশে উড়তে সমর্থ হয়। ফলে পুতনা ভয়ঙ্কর চীৎকার করতে করতে শিশুকে নিয়েই আকাশ পথে মথুরার দিকে যেতে আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য একবার মথুরায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে শিশুকে নিজের কোল থেকে ছাড়াবার একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কারণ সেখানে আরও অনেক অসুর রয়েছে। কিন্তু পুতনার এই উদ্দেশ্য সফল হলো না। সামান্য কিছুদূর গিয়েই পুতনার পর্বতপ্রমাণ দেহ নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে যায়। শিশু তখনও পুতনার বুকেই সংলগ্ন থেকে যায়।

৫. পুতনার মৃত্যু এবং যশোদা-রোহিণী প্রমুখ কর্তৃক শিশুর রক্ষা-বিধান:

নন্দালয়ে যশোদা-রোহিণী প্রমুখ গোপীরা একসময় পুতনার আর্তনাদ, রাক্ষসী রূপ ধারণ এবং বক্ষ সংলগ্ন শিশুকে নিয়ে উড়ে যেতে দেখে ভয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে দেখে তারাও দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে রাক্ষসীর পিছনে ছুটতে আরম্ভ করলেন। কিছুদূর গিয়ে তারা দেখলেন, রাক্ষসী মরে পড়ে আছে আর কৃষ্ণ নির্ভীকভাবে মৃত রাক্ষসীর বুকের উপর বসে হাত পা ছুড়ে আনন্দ করছে - অর্থাৎ আনন্দে খেলা করছে। এই দেখে তারা অত্যন্ত অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি রাক্ষসীর বুক থেকে শিশুকে এনে বুকে ধারণ করলেন। গোপীরা মনে মনে ভাবলেন - এই শিশুর এখনও ভয়ঙ্কর বিপদ বুঝবার বয়স হয়নি - তাই সে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপা রাক্ষসীর বুকের উপর আনন্দে খেলা করছিলো। যাক নারায়ণের কৃপায় আজ এই শিশুর প্রাণরক্ষা পেল। রাক্ষসীর স্পর্শজনিত অমঙ্গল দূর করবার জন্য যশোদা, রোহিণী প্রমুখ গোপীরা তখন শিশুর শরীরে সরষে ছিটালেন এবং গরুর পুচ্ছ (লেজ) স্পর্শ করিয়ে এবং ভগবানের বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করে শিশুর রক্ষা-বিধান সম্পন্ন করলেন। শিশুহত্যাকারী রক্তখেকো রাক্ষসী পুতনা হিংসা করার লক্ষ্যেই শ্রীহরিকে তার বিষমিশ্রিত স্তন পান করিয়েছিল। আর তার ফলেই সে সদ্গতি লাভ করলো।

৬. ভগবানের হাতে নিহত হয়ে পুতনার ধাত্রীগতি লাভ:
রাক্ষসকূলে পুতনার জন্ম, শিশু রক্তপায়ী, অপরের হিংসা করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। এজন্য সে ভগবানের কৃপালাভের জন্য কোনভাবেই যোগ্য ছিল না। তবু ভগবান তাকে ধাত্রীগতি দান করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন? সাধারণ জ্ঞানে এর কোন উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র বলা যায় এ হলো ভগবানের অচিন্ত্য এবং অহৈতুকী কৃপা শক্তির অভিব্যক্তি। এরকম কৃপা তিনি আর কোথাও করেননি বলেই মনে হয়।

পুতনা ভগবানকে স্তন্যদান করেছিল যদিও তার পিছনে ছিল হিংসা প্রবৃত্তি। কিন্তু ভগবান এতই করুণাময় যে তার এই স্তন্যদানের মধ্যে যে দোষ ছিল, হিংসা-প্রবৃত্তি ছিল, সেসব কিছু তার গুনে রূপান্তর করে পুতনার স্তন্যদানকেই তার সেবারূপে গণ্য করে ভগবান গ্রহণ করেছিলেন। সকলের সবদোষ হরণ করেন বলেই তো তাঁর নাম "হরি"।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, - বিষযুক্ত স্তন্যদান করেও যদি পুতনা মুক্তি লাভ করে থাকে, তবে কৃষ্ণের মাতৃস্থানীয়াদের মতো বিশ্বাস এবং আদরের সাথে যারা অখিল-অধিপতি কৃষ্ণকে নিজেদের অতি প্রিয় বস্তু অর্পণ করেন তাঁদের যে পরমগতি লাভ হবে - তাতো নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

৭. পুতনা মোক্ষ লীলার তাৎপর্য্য:
পুতনা বধ লীলায় ভগবান যে কৃপা-বৈভব প্রকাশ করেছেন, তা সাধারণ জীবের ধারণাতীত। ভগবানের কোন লীলায়ই এমন অবস্থা দেখা যায়নি। ভগবান তাঁর শত্রুভাবাপন্ন জীবদের নিহত করেই ক্ষান্ত হন না। তিনি নিহত জীবদের সদ্গতিরও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঐ সব সদ্গতি কেবলমাত্র মুক্তিদান পর্য্যন্তই সীমিত। কিন্তু পুতনার বেলায় তিনি তাকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরম-প্রেম দান করেন। শেষ পর্য্যন্ত তাকে ধাত্রীগতিরূপ ভগবৎ সেবার অধিকার পর্য্যন্ত প্রদান করেন। এমন দয়া তিনি আর কোন লীলাতেই প্রকাশ করেন নি।

ভগবৎ সেবার অধিকার প্রদান করাই হচ্ছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। ভগবান তাঁর এই শ্রেষ্ঠ জিনিস পুতনাকে দিয়েছিলেন। অথচ এরূপ জিনিস পাওয়ার কোন যোগ্যতাই পুতনার ছিল না। মনে হয় এই লীলা ভগবান কৃষ্ণের শিশুভাবেরই পরিচয়। শিশুরা যাকে ভালোবাসে, তাকে সবকিছুই দিয়ে দেয়। এবিষয়ে তারা কোন বাচ-বিচার করে না। ভগবান তাঁর প্রথম বাল্যলীলায় এই শিশু ভাবেরই প্রকাশ করলেন। এইতো ভগবানের অসীম কৃপা-বৈভবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ তাঁর বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলেন - নন্দের নন্দন নন্দালয়ে জন্মের পর পুতনা রাক্ষসীকে বধ করে তাঁর পরম করুণাময় লীলার সূত্রপাত করেছেন। তিনি পুতনাকে মাতৃ-গতি প্রদান করে তাঁর লীলা আরম্ভ করেন বলে মনে হয়। এতে সবারই মনে হওয়া উচিত যে যাঁর ভক্তের বেশ এবং ভাবের অনুকরণ করে রাক্ষসীরও জননী গতি লাভ হয়, সত্যই তাঁর ভক্ত হলে না জানি আরও কত কি লাভ হতে পারে। এই লীলায় ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য গুণের পরিচয় বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর ভক্তকে এতটাই ভালোবাসেন যে যদি কেউ তাঁর ভক্তের বেশ ধারণ করে ভক্তির অনুকরণও করে তাহলেও তিনি তাকেও কৃপা করতে কুন্ঠিত হন না।

৮. পুতনা রাক্ষসীর পূর্ব ইতিহাস এবং ভগবানের এই লীলায় বিভিন্ন রসের সৃষ্টি:
শ্রীল রূপগোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ১২টি রসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি হলো মুখ্য রস - যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য। আর ৭টি হলো গৌণরস। যেমন হাস্য, রৌদ্র, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস এবং বীর রস। নীচে আমরা পুতনার পূর্বজীবন এবং তার রাক্ষসজীবনে ভগবানকে বিষমিশ্রিত স্তন্য প্রদানের সময়সীমায় উপরোক্ত ১২টি রসের মধ্যে কখন এবং কোন অবস্থায় কোন রস সৃষ্টি হয়েছিল তা অতি সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হলো।

আমরা জানি প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন শ্রীহরির অত্যন্ত স্নেহভাজন ভক্ত। তাঁর ছেলে ছিলেন মহারাজ বিরোচন। বিরোচন মহারাজের পুত্র হলেন বলী মহারাজ। এক সময় বলী মহারাজ তার গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে স্বর্গের ইন্দ্রপদ লাভের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ইন্দ্র ছিলেন কশ্যপ মুনি এবং অদিতির পুত্র। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় অদিতি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাকে প্রবোধ দিয়ে বলেন যে তিনি নিজে বামনরূপে তার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে বলী মহারাজকে যজ্ঞ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করবেন। যথারীতি এক সময় ভগবান বামনরূপে অদিতির পুত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়ে যথাসময়ে বলি মহারাজের যজ্ঞ স্থলে যেতে আরম্ভ করেন।

ঐ সময় খর্বাকৃতি ভগবানের অতি সুন্দর রূপ দেখে বলী মহারাজের কন্যার মনে দুটি ভাব সৃষ্টি হয়:- একটি ছিল অবাক দৃষ্টি। অন্যটি ছিল বিস্ময়। এই অবাক দৃষ্টি থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল। আর বিস্ময় মনোভাব থেকে অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হয়। বলী মহারাজের কন্যা রত্নাবলী বিষ্ণুর অতি সুন্দর চেহারা দেখে মনে মনে ভাবে যে, ইস! আমার যদি এমন একটা সুন্দর ছেলে হতো বা থাকতো তবে তাকে আদর করতে পারতাম। অন্তর্যামী ভগবান তা জানতে পেয়ে বলেছিলেন - তথাস্তু। অর্থাৎ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। আবার যখন বিষ্ণুদেব ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণের ছলে বলীর সমস্ত সম্পদ অধিকার করে নেন তখন রত্নাবলী দুঃখে ও শোকে কাতর হয়ে বলেছিলেন - এরূপ পুত্রকে বিষ দিয়ে মারা উচিত। তখনও ভগবান বলেছিলেন, তথাস্তু। এক্ষেত্রে রত্নাবলীর মনে রৌদ্র রসের (যে রস ক্রোধ সৃষ্টি করে) সৃষ্টি হয়েছিল। আর বিষ্ণু যখন বলীর সমস্ত সম্পদ কেড়ে নেন তখন এই রত্নাবলীর মনে করুণ (যা বেদনাদায়ক - এরূপ রস) রসের সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যদিকে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য যখন পুতনা অতি সুন্দরী নারীর বেশে নন্দালয়ে প্রবেশ করে তখন গোপীদের মনে অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হয়। পুতনা কৃষ্ণকে নিয়ে যাবার সময় ভয়ানক রস এবং তার মৃত্যুর পর তাদের মনে বীভৎস রসের সৃষ্টি হয়েছিল।